যে যেখানে দাঁড়িয়ে

কাবেরী রায়চৌধুরী

বৃষ্টি পড়ছিল গুঁড়ি গুঁড়ি। ইলশে গুঁড়ি। মনোময় লাহা তার দেড়তলার এক চিলতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরের পটভূমি দেখছিলেন। লটারি ভাগ্যে জিতে নিয়েছিলেন এই

দু'কাঠা প্লটের জমিটুকু। কলকাতার পুবে এইদিকটা এখন সেজেগুজে উঠছে। সেদিক থেকে পড়ন্ত বেলায় ভাগ্যের সন্ধানই পেয়েছেন বলা যায় তাকে। নিজেও সেরকমই অনুভব করেন তিনি। যৌবনে বেশ লড়াই করতে হয়েছে তাকে ভাগ্যের সঙ্গে। দু'পা এগিয়েছেন তো তিন পা পিছিয়েছেন। পৃথিবী সম্পর্কে রোমান্টিক ভাবনাগুলোর উন্মেষের আগেই তার বাবা মারা গেলেন। তিনি তখন দশ, আর বোন নয়। মা স্থানীয় একটি প্রাইমারি ইস্কুলে শিক্ষকতা করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন সংসার। এরকম সংসারে ছেলেমেয়েদের স্বপ্ন দেখা বারণ। তাই তিনি স্বপ্ন দেখতেন না। কৈশোর এল এবং গেল। যৌবন প্রাপ্ত হলেন তিনি। স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্ন ব্যর্থ হল, স্বপ্ন মুছে গেল। ক্রমশ মনোময় সম্পূর্ণ পুরুষ হলেন। বোনকে বিয়ে দিলেন। মা-ছেলের সংসার আবেগশূন্য। তবু সংসার নিজস্ব নিয়মে চলছিল।

সামনেই নোনা জলের ভেড়ি, অনেক দূর পর্যন্ত। দূরে আকাশের কাছাকাছি সীমানা জুড়ে সারি সারি নারকেল গাছ। এ দিকটা নির্জন। ইলশে গুঁড়ি ঝিরঝিরে ফোঁটারা ভেড়ির জলে।

পুব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণ সমস্ত আকাশ জুড়ে বাদল মেঘ সেজে উঠেছে। হু হু বাতাস বইছে এলোমেলো। পুরোনো কথা সব এলোমেলো হয়ে হয়ে মনোময়ের মনে পড়ছিল। শৈশব কৈশোর তো বড় বেশি দূরের স্মৃতি নয়। দিনগুলো শুধু ঝোড়ো বাতাসের মতো বয়ে যায়। ভেড়ির ধারে ছিপ ফেলে বসে থাকা এক বালককে দেখে নিজেকে দেখতে পেলেন যেন। মনটা কেমন করে উঠল তার। অনেকগুলো সময় ফেলে এসেছেন তিনি, ভাবতে লম্বা শ্বাস পড়ল। তবু ভালও লাগছে। হাতে আর দুটো বছর। তারপরে অবসর চাকরি জীবন থেকে। তার আগেই সংসার গুছিয়ে নিতে পেরেছেন। একমাত্র মেয়ে টিটু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাপ্তি বছরে। তার ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে যেতে পেরেছেন। বাড়িটাও হয়ে গেছে ভালোয় ভালোয়। নিজেদের দুজনের জন্যেও কিছু সঞ্চয় করেছেন। তারপর অবসরের পেনশন তো আছেই। চিন্তাশূন্য জীবন !

ভালো ! মনে মনে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ালেন মনোময়। অবসরে বসে মন দিয়ে

কাব্য সাধনা করবেন, ভাবতেই বেশ পুলকিত বোধ করলেন। কবিতা লেখার একটা ঝোঁক তো তার ছিলই আশৈশব। অথচ হয়নি।

আকাশে মেঘ গাঢ় হয়েছে। বৃষ্টির দাপটে এখন সামান্য বেশি। ঝিরঝিরে গুঁড়িগুলো বড় ফোঁটা হয়ে নেমেছে। ঘড়ি দেখলেন মনোময়। সাড়ে নটা। অথচ মনে হচ্ছে সন্ধে নেমেছে। বেরোতে হবে এখনই। দেরি যা হওয়ার হয়ে গেছে। কোনওদিনই এমন দেরি হয় না তার অফিসে পৌঁছতে। আবেগশূন্য হয়েই কর্তব্য করে যান বরাবর। তবু আবেগপ্রবণ তিনি। মাঝে মাঝেই আবেগ কোথা থেকে হুশ করে উঠে সমস্ত কিছু তছনছ করে দেয় যেন। আজ যেমন হচ্ছে ! হেসে ফেললেন মনোময় নিজের আবেগপ্রবণতা দেখে।

ভালো ! তবু, ভালো, এখনও আবেগ-টাবেগগুলো আছে। ভাবতেই আর এক প্রস্থ হেসে ফেললেন মনোময়।

-- হাসছ ! বৃষ্টি দেখে ? সুধার গলা। পিছন থেকে কিভাবে যেন বুঝতে পেরেছেন, মনোময় হাসছেন, বললেন, আজ যে বড় বেরোলে না ?

-- ইচ্ছা করছিল না।

হেসে ফেললেন সুধা, স্বামীকে এমন মেজাজে বড় একটা কোনও দিনই তিনি দেখেননি। অথচ সুধা মনে মনে আশা করতেন, মনে মনে তার ইচ্ছা হত, একটু তো রোমান্টিক হন মনোময়। মনোময় যার নাম, তার মন নেই, এ তো হতে পারে না। যদিও কখনও কর্তব্যের কঠিন কঠিন মুখোশটা খসে পড়েও গেছে, বেরিয়ে পড়েছে নরম অনুভূতিশীল একটা ঝকঝকে মন আর সেটুকুই সুধার এত বছরের বিবাহিত জীবনের ছোট্ট ছোট্ট উপহার। মনোময়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন সুধা। বৃষ্টির তীব্রতা বেড়েছে আরও। ঝাপসা এখন দূরের পথ, আকাশ সীমা। ভেড়ির জলে বৃষ্টিপতন অপূর্ব দৃশ্য তৈরি করেছে। সুধাও অনেকদিন, অনেক কাল পরে তন্ময় হলেন, বললেন, বেশ লাগছে কিন্তু। আজ না হয় অফিসে না গেলে -- উৎসুক চোখে

তাকালেন মনোময়ের দিকে।

-- তা হয় না। আজ জরুরি টেন্ডার ওপেন হবে। আমাকে থাকতে হবে। আমার হাত দিয়েই পাস হবে ওগুলো।

-- ও। অফিসের জরুরি কাজের সঙ্গে আবেগের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাই চুপ করে গেলেন সুধা।

বেরিয়ে পড়লেন মনোময়। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। গাড়ি বার করলেন। আজ নিজেই গাড়ি চালাবেন মনস্থ করলেন। গাড়ি চালানোর মধ্যে চিরদিনই একটা মজা খুঁজে পান তিনি।

গাড়ি ছুটে চলেছে। বাইপাস ধরে, গাড়ির গতি বাড়ালেন মনোময়। সামনে ঝাপসা পথ। দু'ধারে সবুজ আর নোনাজলের ভেড়ি। কেন জানি ভাল লাগছে আজ হঠাৎই। আর সেই হঠাৎ ভাললাগার মধ্যে আচমকা কেন জানি বিষন্নতা ছুঁয়ে গেল। মন খারাপের কারণ খুঁজতে চেষ্টা করলেন না তিনি। কারণ বিষাদ যখন গাঢ় হয়ে মনকে ছেয়ে যায়, তখন বিষাদের কারণের খোঁজে গভীরে গোপনে ডুব দেওয়ার অবস্থায় থাকে না মন। সুধার কথা মনে পড়ল মনোময়ের। ভালো মেয়ে বলে যাকে এক বাক্যে চিহ্নিত করা যায়। মা বেঁচে থাকতেই সুধাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন তিনি। একটা একটা করে অতীতের পৃষ্ঠা উন্মুক্ত হচ্ছে আজ এখন। মনোময় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন সুধাকে। রোগা, লম্বা, মধ্যমবর্ণা লাবণ্যময়ী যুবতী সুধাকে। ভালবাসার বিয়ে, তাই মা নিরাপত্তাহীনতায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। সুধার রূপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আর সুধা মেয়েলি ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝে নিয়েছিলেন তাঁকে। শাশুড়িকে সবসময় বুঝিয়ে দিতেন, তিনিই এই সংসারের সর্বময় কর্ত্রী। শেষের দিকে মা স্বস্তি পেয়েছিলেন। ভাবতে ভাবতে সুখবোধ করলেন মনোময়। তার জীবনসঙ্গী নির্বাচন ব্যর্থ হয়নি।

মা মারা গেলেন ...

ক্রমে তাদের সংসারে বিয়ের অনিবার্য ফসল এল মেয়ে, টিটু। স্বামী-স্ত্রী প্রেমিক-প্রেমিকার ভূমিকা ছেড়ে কীভাবে যেন দুজনে বাবা-মা হয়ে গেলেন একদিন। নিজেদের যেন কোনও স্বপ্ন থাকতে নেই যুবক-যুবতী মা-বাবাদের। সন্তানের জন্য স্বপ্ন

দেখাতেই তাদের আনন্দ। সুধা আর তিনি নিজেদের খুঁটিনাটি আনন্দ ত্যাগ করে মেয়ের জন্য স্বপ্ন বুনতে শুরু করে দিলেন একসময়ে। মনোময় রোজগার করছেন, সঞ্চয় করছেন, ভবিষ্যতের হিসাব কষছেন আর সুধা আয়-ব্যয়ের নিঁখুত হিসাব করে সংসার সামলাচ্ছেন, মেয়ে মানুষ করছেন। গাড়ির আয়নার কাচে মুখ দেখলেন মনোময়। যৌবন ফেলে আসা হিসেবি এক প্রায় প্রৌঢ়ের মুখ দেখতে পেলেন। নিশ্চিন্ত অবসর যাপনের দিন প্রায় সমাগত। মনে ভাবলেন, নিশ্চিত প্রৌঢ়ত্বে যদি যৌবনের মনটাকে ফিরিয়ে আনতে পারেন ? আশ্চর্য ! ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সজোরে হেসে উঠলেন মনোময়। কী সব ভাবছেন আজ !

মনের গতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করলেন এবার। টাকা আগাম নিয়েছেন তিনি। কল্লোল দাশের টেন্ডারটা পাশ করাতেই হবে। মনকে প্রবোধ দিলেন, এমন কিছু অন্যায় করেননি তিনি। জীবনে যতবার ঘুষ নিয়েছেন, তাতে উভয় পক্ষের কারওরই কোনও ক্ষতি হয়নি। আর কল্লোল দাশের টেন্ডারটা পাস করিয়ে দিলে, কল্লোল দাশেরই উপকার করবেন তিনি। ছেলেটি ব্যবসা করতে এসে বারবার হেরে যাচ্ছে। ফলে তার টেন্ডার পাস করিয়ে দিলে, একজন ছেলের ভবিষ্যৎ গঠনেই সাহায্য করবেন তিনি। আর তার বিনিময়ে সে যদি কিছু অর্থ উপহার বাবদ দিয়েই থাকে, তা গ্রহণে আপত্তি থাকবে কেন তার ?

মনে মনে যুক্তি সাজালেন তিনি পরপর। যুক্তিগুলো তার কাছে অকাট্য। তারপর বললেন, কী হে মনোময়, যুক্তিগুলো ভালই সাজিয়েছ তো। তা বেশ। পেছন থেকে অদৃশ্য একটা হাতের চাপড় খেলেন পিঠের উপর। ভাল ভাল। এগিয়ে যাও ভাই। বিবেকবাবুকে মাথা তুলতে দিও না বিশেষ। তাহলেই সব্বনাশ।

শুয়ে শুয়ে বৃষ্টি দেখছিল কল্লোল। সকালে যতটা কালো ছিল আকাশ, এখন তার চেয়ে বেশি ঘন হয়েছে। ভগবানের উদ্দেশ্যে দু-চারটে গালাগাল দিল। মুখ ভার

যথেষ্টই খারাপ। রাগের সময়ে অশ্রাব্য খিস্তি বেরিয়ে যায় জলপ্রপাতের মতো। একবার বলল, শালা, আবার হারামিগিরি করতে শুরু করে দিয়েছে ভাগ্যটা, আজকেই বৃষ্টি না হলে চলছিল না। আর হবি তো হ, তা বলে শুয়োরের বাচ্চার মতো বৃষ্টি ? কোনও মানে হয় ?

-- বৃষ্টিটা ওইরকম বাচ্চা হয় কী করে ? চা দিতে এসে হেসে ফেলল মধুমিতা। সবকিছুই তোমার ওই ইসের বাচ্চা আর 'ব' কার অন্ত শব্দ ?

-- তা নয় তো কী ? কী বলব বলো ? আজকে শালা টেন্ডার ওপেন হবে, মনোময়-দাই যাদি না আসতে পারে, গেল তবে।

-- বলা আছে তো ?

-- বলা মানে ? পয়সা খাওয়ানো আছে। যদিও জানি, মনোময়দার কথা মতোই আমারটাই লোয়েস্ট প্রাইস রেখেছি, পাস হবেই, তবু ... ও ...। কী দরকার ? একটা খচখচে ব্যাপার থেকেই যায়। আমার যা ভাগ্য শালা। দেখছ তো। হতে হতেও হয় না। এবার এটা হয়ে গেলে গুছিয়ে বসতে পারব হয়তো।

-- আগে থেকে অত ধেই নেচো না। হোক আগে। কটায় বেরোবে ?

-- বারোটায় ওপেন। পৌনে এগারটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ব।

-- ফিরতে ফিরতে ?

-- ছটা নাগাদ এসে আবার বেরোতে হবে।

মনের মধ্যে হাজার একটা প্রজাপতি নেচে উঠল। হাজারটা ভ্রমর মধুমিতার মনে গুনগুনিয়ে উঠল। তাহলে আজ বিশ্বজিৎকে ডেকে নেওয়া যেতে পারে। কটা মাস ধরে জ্বালিয়ে খাচ্ছে সে। এক বুলি, -- চলো না, কোথাও বেরিয়ে আসি। দু-চারদিনের

জন্য।

কিছুতেই শুনবে না মধুমিতার কোনও আপত্তি। অভিমান করে বাবু, আজ দু'সপ্তাহ একটা টেলিফোন করেনি। মাঝে একদিন অফিসে ফোন করেছিল মধুমিতা। বাবা: কী গম্ভীর গলা। সোজা বলে দিল, হয় আমার সঙ্গে বেরোবে, আর না হয় সম্পর্ক নেই। ভুলে যাও।

কী মুশকিল ! মধুমিতা বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, বলেছিল, শোন, তুমি বরং অর্নাকে নিয়ে কটা দিন ঘুরে এসো। আমি কিচ্ছু মনে করব না। রাগ করব না। এটা তো আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর মধ্যেই আছে।

নাহ ! তবু সে সব কথায় কর্ণপাত করল না বিশ্বজিৎ। তার মনে কথা, অর্ণাকে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে জড়িও না। ও মায়ের পুত্রবধূ, ব্যাস।

মায়ের পুত্রবধূ হলেও, তোমার আইনি স্ত্রী সে। তারও তো ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে বিশ্ব। কেন জানি অর্ণার জন্য খারাপ লাগছিল মধুমিতার। হাজার হোক, সেও একটা মেয়েই তো। অথচ কিছুই করার নেই মধুমিতার। কারণ মধুমিতা ভালবাসে বিশ্বজিৎকে এবং বিশ্বজিৎও। অর্ণা আসার অনেক আগে থেকেই মধুমিতা বিশ্বজিতের জীবনের নারী। মায়ের কথা রাখতে বিশ্বজিৎ মধুমিতার সম্মতি নিয়েই অর্ণাকে বিয়ে করেছে। সেখানে মনের দূরত্ব লক্ষ আলোকবর্ষ।

বিশ্বজিৎ এবার মোক্ষম অস্ত্রটা প্রয়োগ করেছিল, তাহলে তুমিও কল্লোলদাকে নিয়ে সেকেন্ড হানিমুনটা সেরে এসো। ঠকাস করে ফোনটা রেখে দিয়েছিল বিশ্বজিৎ। জানত সে, মধুমিতাকে জব্দ করার এর চেয়ে ভাল কোনও উপায় নেই। কারণ সে ভালভাবেই জানে, কল্লোলের সঙ্গে মধুমিতার সম্পর্কও দীর্ঘদিন না সম্পর্ক হয়ে রয়েছে। এক ছাদের তলায় ভারতীয় চিরন্ত ঐতিহ্যের বসবাস মাত্র। আশ্চর্য, এইভাবেই হয়তো গোটা একটা জীবন দুটো মানুষ কাটিয়ে দেবে সম্পর্কহীন হয়ে। তারা একসঙ্গে খায়, বসে, কথা বলে, হয়তো বসবাসের অভ্যাসে মমত্ববোধও আছে, তাদের যা নেই, তা দাম্পত্য। মধুমিতা বিশ্বজিতের ওই কথার পরে আর কিছু বলেনি

সেদিন। অভিমান বুঝি তারও হয় না ? তারও বুঝি ইচ্ছা করে না বিশ্বজিতের হাতে হাত দিয়ে সমুদ্র বেলাভূমি ধরে নিমগ্ন হেঁটে যেতে ? তারও বুঝি ইচ্ছা করে না, বিশ্বজিতের কাঁধে মাথা রেখে নিজেকে সম্পূর্ণ অর্পণ করে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে হারিয়ে যেতে ? তারও বুক জোড়া ইচ্ছার পাহাড়। তবু হয় না, কল্লোলকে কী বলবে সে ? আর এই মধ্য তিরিশে কলেজের ছাত্রীর মতো মিথ্যে বলে প্রেমিকের সঙ্গে অভিসারে যাওয়া, কেন জানি বড্ড খারাপ লাগে। কুরুচিকর প্রস্তাব যেন ! গত আট বছরের সম্পর্কে তবু তো দু'দুবার বেরিয়েছিল সে মিথ্যে বলে। একবার সুন্দরবন, আর একবার পুরি। কিন্তু বারবার এমন মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে প্রেমিকের হাত ধরে বেরিয়ে পড়তে তার মন সায় দেয় না। তাছাড়া কল্লোল হয়তো বুঝতেও পারে কিছু। সম্পর্ক থাক বা না থাক, এই সম্পর্ক বুঝতেও পারে কিছু। সম্পর্ক থাক বা না থাক, এই সম্পর্ক বুঝতে দিতেও সে চায় না কল্লোলকে। থাক না যেটুকু আছে সম্পর্কের অবশিষ্ট। থাক সেটুকুই। আড়াল হয়ে থাক সম্পর্কের আড়ালের অন্য সম্পর্ক ; তার সুবাস। এইভাবেই বেঁচে থাকবে মধুমিতা কল্লোল অথবা বিশ্বজিৎ অর্নারা।

চা রেখে বাইরের বারান্দায় এসে এক মুহূর্ত দাঁড়াল মধুমিতা। আজ দুপুরেই ডেকে নেবে বিশ্বজিৎকে বাড়িতে। তারপর তার যত অভিমান আদর দিয়ে ভেঙে দেবে। এ সুযোগ বড় একটা পাওয়া যায় না। কারণ, কল্লোল প্রায় দিনই বাড়ির বাইরের ঘরে বসে অফিসের কাজকর্ম করে।

তাড়াতাড়ি চালে ডালে খিচুরি চাপিয়ে দিয়ে, ঘরের দরজা বন্ধ করে ফোন করল মধুমিতা।

অভিমানী গলা বিশ্বজিতের -- এতদিন পর ? কী মনে করে ?

-- তুমিও তো করতে পারতে।

-- পারতাম না।

-- কেন ?

-- বলেই দিয়েছি তো।

-- আজ বারোটার মধ্যে বাড়িতে চলে আসবে। সরাসরি হুকুম করল মধুমিতা।

-- কল্লোলদা ?

-- বেরোবে। ইমপর্ট্যান্ট কাজ আছে।

-- আমার অফিস ?

-- ডুব দাও। হাফ নিয়ে নাও। বলো একটা কিছু।

বিশ্বজিতের গলার স্বর এখন অন্যরকম। খুশিতে উছলে উঠেছে সেও ভেতরে ভেতরে বোঝা যাচ্ছে। বললল, তারপর ? এসে ?

-- তোমার যা ইচ্ছা --

-- ঠিক তো ?

-- হ্যাঁগো বাবা হ্যাঁ।

ফোন রেখে রান্নাঘরে এল মধুমিতা। প্রবল বর্ষণ চলছে এখনও। পুরো আকাশটাই যেন ফুটো হয়ে জল ঝরছে। ভাল লাগছে তার। মনে পড়ল, এরকমই এক মেঘ ভাঙা বৃষ্টি হওয়া দুপুরে বিশ্বজিৎকে নিবিড় করে পেয়েছিল সে। বৃষ্টির দিনে অভিসার কি কাণায় কাণায় সার্থক হয় ? কে জানে ? তবে সেইদিন হয়েছিল। শরীরে মনে এতটুকু ফাঁক ছিল না সেদিন। ভাবতেই আশ্চর্য একটা অনুভূতিতে সিরসির করে উঠল তার

শরীর।

বিছানা ছেড়েছে কল্লোল। চাপা উত্তেজনা একটা আছেই তার। ব্যবসার যা অবস্থা, তাতে এই কন্ট্রাক্ট না পেলে না খেয়ে মরতে হবে। তার ওপর ঘরের থেকে টাকা খরচ করেও বসে আছে। মনোময়দা ফাঁসিয়ে দিলে নির্ঘাত ঝুলে যাবে সে।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিল কল্লোল। ভগবান তবে বিশ্বাস না করলেও ঈশ্বরকে ডাকল সে, হে বাবা, কাজটা যেন পেয়ে যাই আমি।

ঘড়িতে এখন সময় সাড়ে দশটা। মনে ভাবল, একবার ফোন করে দেখলে হয় না ? মনোময়দার সঙ্গে একটু কথা বলে নিলে অন্তত পূর্বাভাষ পাওয়া যাবে কিছুটা।

-- খিচুরি হয়ে গেছে। ডিম ভাজাও। দেব ? রান্নাঘর থেকেই গলার স্বর উঁচু করল মধুমিতা। মনে মনে উত্তেজনা বোধ করছে সে। তাড়াতাড়ি খাইয়ে বার করে দিতে পারলে হয় কল্লোলকে, তারপর স্নানটান সেরে প্রস্তুত হয়ে নেবে সে। বিশ্বজিৎ শৌখিন। সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ। তার জন্য সে সাজবে আজ। যদিও তারপরে সেই সাজের আর অবশিষ্টও থাকবে না, সে জানে। আদরের পর তার সমস্ত শরীর জুড়ে অনন্য পুলকবোধ অলঙ্কার হয়ে জড়িয়ে থাকবে। ভাবতেই শরীরে জলোচ্ছ্বাস যেন।

-- দিয়ে দাও। ঠান্ডা হোক ততক্ষণে। তার আগে একটা ফোন করে আসি। ব্যাটাচ্ছেলে মনোময়দা দেখি এসেছে কিনা ! বলতে বলতে ফোনের বাটন টিপল কল্লোল।

কান সজাগ করে আছে মধুমিতা। কী কথা হয় শুনতে হবে তাকে। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে আগের থেকে বেশি। কাছেপিঠে কোথাও বাজ পড়ল বিরাট ভয়ঙ্কর শব্দে। মেঘও ডাকছে ঘন ঘন। দিনের বেলাতেই সন্ধে নেমেছে যেন। খিচুরি থালায় ঢেলে চামচ দিয়ে নেড়েচেড়ে দিল মধুমিতা। ঠান্ডা হয়ে যায় যাতে তাড়াতাড়ি। মনের মধ্যে

আনন্দের পূরণ ঝলকে উঠছে, কতদিন পর একদম নিজের করে পাবে বিশ্বজিৎকে।

মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। বাতাসের চেয়েও দ্রুতগতিতে। সমস্ত অফিস স্তব্ধ। জুনিয়ার ক্লার্ক যে মেয়েটি মনোময়বাবুর কাছে গিয়েছিল ফাইল সই করাতে, সেই মেয়েটি দরদর করে ঘামছে। হাত-পা কাঁপছে তার থরথর।

সবাই ঘুরেফিরে একই প্রশ্ন করছে তাকে, মিস বাসু, আপনি গিয়ে কী দেখলেন ? নেই ?

কেঁদে ফেলেছে মেয়েটি, এক কথা ফাটা রেকর্ডের মতো বাজিয়ে চলেছে, না, নেই। নেই ... নেই ... মাথাটা হেলে ..., বাকি কথা আটকে যাচ্ছে মেয়েটির গলাতেই।

স্তব্ধ, নিস্পন্দ, নির্বাক, সহকর্মী সবাই এই মুহূর্তে।

কল্লোলের হাতে রিসিভার থমকে গেছে। ভেজা চুল ঘেমে উঠল মুহূর্তে। চোখের সামনে ধূ ধূ অন্ধকার। রিসিভার ক্রেডলে না রেখেই সোফায় বসে পড়ল ধপ করে। প্রথমে খানিকক্ষণ চুপ, তারপরেই বেরিয়ে এল অকথ্য 'ব' কার অন্ত গালাগালের বন্যা।

মধুমিতা খিচুরি ঠান্ডা করতে করতে হতচকিত, ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছে না। বলল, কী হল টা কী ? বসে পড়লে ? মুখ খারাপ করছই বা কেন ?

মধুমিতার দিকে ভাষহীন তাকিয়ে রইল কল্লোল। অবশেষে বলল, আমার পেছনে কাঠি করবে বলে শালা মরেই গেল ? শালা, এই কাঠিটা না করলে হতো ন ? মরে গেল একেবারে। আজকেই ?

-- কল্কী ! ! ! মরে গেল ? ক্কে ? আশ্চর্যের সমধিক এক স্তর থেকে বেরিয়ে এল মধুমিতার কণ্ঠস্বর। কে মরে গেল ? কে মরে গেল গো ?

-- মনোময় লাহা ! স্ত্রীর দিকে বোবা ভাষাশূন্য পলকপতনহীন তাকিয়ে কল্লোল, অশরীরির মতো শব্দ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, মরেই গেল লোকটা !

-- কী যা তা বলছ ? ইয়ার্কি মারছ ?

-- ইয়ার্কি করে যদি লোকটা বেঁচে ওঠে, আমি বেঁচে যাব মধুমিতা। এই কল্লোল দাশকেও মেরে দিয়ে গেল শালা মনোময় লাহা। মরার আর দিন পেলি না তুই ? আজকেই মরতে হল তোকে ? অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে কল্লোল যতিহীনভাবে। বলল, আচ্ছা তুমিই বলো, এ শালা তোমার ওই শিবুদার ষড়যন্ত্র নয় তো কী ? এত বলি ওসব শিবের পুজোটুজো কোরো না। শোনো না তো ? মাঝখান থেকে মাসে নয় নয় করে কুড়ি-পঁচিশ টাকার নকুলদানা আর ফুলের খরচ ! শাল্লা ! এখন আমি কী করি ?

হাত-পা ধীরে ধীরে স্ববশে থাকছে না বুঝতে পারছে মধুমিতা। হাজার প্রজাপতির পাখনা ছিঁড়ে নিল কে যেন। হাজার ভ্রমরের গুঞ্জন স্তব্ধ। ঘ্যাসঘেষে গলায় একবার শুধু বলল, কী হবে তাহলে ?

সোফা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠেছে কল্লোল। রিসিভার ক্রেডলে রাখতেই ফোনটা বেজে উঠল। ধক্ করে উঠেছে মধুমিতার বুক। তবে কি বিশ্বজিৎ ?

-- হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরো। নাও সামনেই আছে। ... না বেরোব না আজ। আরে শালা, যার সঙ্গে কাজ, সেই লোকটাই অফিসে এসে হার্ট অ্যাটাক করে সোজা মরে গেল আজ ! ভাবা যায়া ! আজ আর কোনও কাজ হবে না অফিসে। ... হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার পশ্চাদদেশ মারা গেল। আসছ নাকি ? চলে এসো, আড্ডা মারা যাবে। ফোন রেখে শরীর ফেলে দিল কল্লোল সোফার উপর। চোখ বন্ধ। কপালের ভাঁজ। মধুমিতার খাবার টেবিলের পাশেই বসে পড়ল। বিশ্বজিতের মুখটা মনে পড়ছে শুধু। কী পরিমানে আশাহত হবে সে, ভাবতে পারছে না। টেলিফোনের সংলাপ শুনে মনে হল বিশ্বজিৎই, তবু স্থির সিদ্ধান্তে আসার জন্য জিজ্ঞেস করল মধুমিতা, কে ? --

বিশ্বজিৎ।

মাথার ভেতর চাপ বাধা অন্ধকার পুঞ্জীভূত হল। শরীর শুকিয়ে উঠছে যেন মধুমিতার। সত্যিই মনোময় লাহা নিজে মরে মেরে দিয়ে গেল আজ মধুমিতাকে বিশ্বজিৎকে। কত কতদিন পর তারা মিলিত হত।

সোফায় শুয়ে বিড়বিড় করছে কল্লোল। টেন্ডার ওপেনিং-এর দিন অবধারিতভাবে পিছিয়ে যাবে। হয়তো, নতুন অফিসার মনোময়ের স্থলাভিষিক্ত হলে, আবার নতুন করে টেন্ডার ডাকবেন। হতে পারে এমন। অতীতের এমন অনেক অভিজ্ঞতা আছে তার। তা হলে আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। পাঁচ হাজার টাকা চোট হয়ে গেল। মনোময়কে খুশি করতে এইটুকু উৎকোচ দিয়েছিল কল্লোল। মাথা কাজ করছে না তার। এ-কূলও গেল, ও-কূলও গেল তার। পাঁচ পাঁচটি হাজার টাকা তার কাছে কম নয়। 'চ'কার, 'ব'কার, 'শ'কার অন্ত সমস্ত গালিগালাজ উজাড় করে দিল কল্লোল এখন অনায়াসে মনোময় লাহা আর নিজের অদৃষ্টের উদ্দেশ্যে।

সুধা বৃষ্টি দেখতে দেখতে যুবতী হয়ে উঠছিলেন। মনের মধ্যে প্রগলভ বোধ ছলকে উঠছিল। তার ছলকানো ঢেউ মনের মধ্যে আছড়ে পড়ছিল, অনুভব করছিলেন সুধা। বর্ষা শেষেই পাহাড়ে যাবেন ঠিক আছে দুজনে। দার্জিলিং থেকে, কার্শিয়াং, কালিম্পং সব ঘুরবেন তারা, স্থির হয়ে আছে। জীবনের আসল সময়টাই বয়ে গেছে বৃথা। তবু সংসারটাকে ভালবাসেন সুধা। আগলে রেখেছেন দু-হাতে স্বামীকে, কন্যাকে। এখন পড়ন্ত দিনের শেষেই না হয় দুজনে সময় খুঁটে খুঁটে পান করবেন। ভাবতেই মন প্রসন্ন হয়ে গেল তার। তীব্র এক ভাললাগা বোধে আচ্ছন্ন হল মন। তাছাড়া আজ সন্ধেয় আরও বড় এক সারপ্রাইজ নিয়ে মা-মেয়ে মনোময়ের জন্য অপেক্ষা করবেন যে। ভাবতেই আবার সাফল্যের অনুভূতি ছুঁয়ে গেল মনকে। আজ টিটু তাদের ভাবী জামাইকে এ বাড়িতে নিয়ে আসবে। সেরামিক ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি। মুম্বাইতে এখন কর্মরত। ছুটিতে এসেছে। ফটো দেখিয়েছে মেয়ে তাকে। এককথায় স্প্রতিভ এবং বুদ্ধিমান চেহারা ছেলেটির। ভাল লেগে গেছে সুধার। মেয়ের উজ্জ্বল সুখী জীবনের কল্পনায় মন ভরে আছে তার। এখন মনে হচ্ছে জীবন বড় সুন্দর। সার্থক মা আর

স্ত্রী সে।

ফোন বাজছে। ছুটে গেলেন সুধা। আর পরমুহূর্তে জ্ঞান হারালেন।

জ্ঞান ফিরল যখন, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করলেন সুধা। তাকে ঘিরে আত্মীয়স্বজন। উৎকন্ঠিত এবং বিষন্ন তাদের মুখ-চোখ। মেয়ে ঝাঁপিয়ে সহসা তার বুকে -- কী হল মা আমাদের। কী হল মা। কেন হল ? কেন হল বলো ? কাঁদছে মেয়ে আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে। সুধার কান্না পাচ্ছে না তো ! বিছানায় উঠে বসেছেন। আলুথালু তার পোশাক। ঘরের সাদা দেওয়ালে চোখ তার নিবদ্ধ। সাদা দেওয়ালের মতোই সাদা একটা ক্যানভাস তার সমস্ত দৃষ্টিবোধ জুড়ে। মাথার মধ্যে ভয়াবহ শূন্যতা ! কী হবে এখন সে বোধটুকুও নেই চেতনায়।

টিটু কাঁদছে, কেঁদে চলেছে -- কী হবে মা আমাদের ? কী হবে ... ? আত্মীয়দের মধ্যে থেকেই কেউ অন্য কাউকে বলল, তবু, জলে ফেলে যায়নি মনোময়দা এদের। রিটায়ার করার আগে বাড়িটাও কমপ্লিট করে গেল। আর বরাবর গোছানো লোক, সঞ্চয়ও নিশ্চয় আছে। পেনশনও পাবে সুধাদি। অন্তত রাস্তায় দাঁড় করিয়ে যায়নি।

কে যেন বলল, সেটুকুই কী সব ? মানুষটাই যে চলে গেলেন। বড্ড ভাল আর সৎ লোক ছিলেন। কষ্ট করে লেখাপড়া করেছেন, চাকরি করেছেন, বোনকে বিয়ে দিয়েছেন, মাকে যত্ন করেছেন, তারপর সুধা বৌদি আর টিটু তো আছেন।

আচমক কেমন স্বস্তি বোধ করলেন সুধা। মাথাটা ঠান্ডা হয়ে আসছে। তীব্র দাহ্য শক্তিটুকু ওই সংলাপটা তার মাথার মধ্যে চাবুক মেরেছে। জলে ফেলে যায়নি মনোময়দা এদের। ... রাস্তায় দাঁড় করিয়ে যায়নি ...। সঞ্চয়ও নিশ্চয়ই আছে ... পেনশনও পাবে ...। জলে ফেলে যায়নি ...।

মনোময় চলে গেলেন অন্য লোকে। সৎকার হল তার দেহ। তিনি এখন অতীত।

লাহা বাড়ি নিঝুম। বৃষ্টি যে খন থেমে গেছে কেউ জানলোই না। এখন অনেক বৃষ্টির

পরেও ঠান্ডা না গুমোট কেউ বোধ করছে না। সুধা খাটে বসে চেয়ে আছেন অন্ধকার জলাধারগুলোর দিকে। মাথার ওপর ছাদ আর চারধারের দেওয়াল তাকে স্বস্তি দিয়েছে কিছুটা। অশ্রুবর্ষণ থামেনি তবু১ বৃষ্টি দেখা, মনোময়ের সকালের মুখটা ছবি হয়ে সেঁটে আছে তার চোখের পাতায় ! কতটা লম্বা পথ পাড়ি দিয়েছিলেন তারা যে !

টিটু ছাদে এসে দাঁড়াল অনেক রাতে। উজ্জ্বল একটা নক্ষত্রের দিকে অপলক চেয়ে আছে। মেঘহীন রাতে অজস্র অসংখ্য নক্ষত্র নীহারিকাপুঞ্জ আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। উজ্জ্বল সেই নক্ষত্রের দিকে চেয়ে সে মনে মনে বলল, আমার নতুন জীবন শুরু হতে দিলে না বাবা ? এত তাড়া ছিল তোমার ? হু হু করে কান্না আসছে তার। নক্ষত্ররা দেখল, গ্রহরা দেখল, রাতের সমস্ত আকাশ দেখল তার কান্না। গুমড়ে উঠছে সে অভিমানে, একটা বছর পিছিয়ে গেল তার বিয়ে।

মধুমিতা আর বিশ্বজিৎ বসে আছে তফাত দূরত্বে। নৈ:শব্দ তাদের মধ্যে গুমড়ে উঠছে। মধুমিতা একসময়ে নৈ:শব্দ ভেঙে বলল, চা খাবে তোমরা ? করি ?

এ বাড়িতে আসা থেকে এখন পর্যন্ত নটা সিগারেট খেয়েছে বিশ্বজিৎ। লক্ষ করেছে মধুমিতা। কল্লোলের সামনে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেছে বিশ্বজিৎ, কিন্তু মধুমিতার দৃষ্টি এড়ায়নি, তার চোখ-মুখের ভয়ঙ্কর সেই যৌন কাতরতা। মলিন হয়ে গেছে মুখ। কেমন বিশ্রী একটা অনুভূতি হল মধুমিতার।

সমস্ত ঘর জুড়ে এখনও মৃত্যু নৈ:শব্দতা, কল্লোল চুপচাপ শুয়ে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছে বোঝা যায়। বলল, চা করবে বলছ ? করো। বলেই লাফিয়ে উঠল তড়াক করে। সিগারেটের বেড়ে ওঠা লম্বা ছাইটাকে টুসকিতে ঝেড়ে ফেলে বলল, জানে দো শালে কো।

-- ভাবছি, ও বাড়িতে এখন কী অবস্থা। ভাবো তো ? মধুমিতার কথার মধ্যেই দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে ছিল। ভুরু কুঁচকে তাকাল বিশ্বজিৎ। মধুমিতা হাসল। সেই হাসি মনোময়ের স্ত্রী সুধার যন্ত্রণা ছুঁয়ে মধুমিতার ওষ্ঠপ্রান্তে। বলল, ভাবছি মৃত্যুর কী ক্ষমতা। আমাদের প্রত্যেককে একটা কঠিন জিজ্ঞাসার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখল তো।

একটা কথা বলব ? ভদ্রলোককে আমি দেখিনি। ওনার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের কথা জানি না। ভাবো তো এই হঠাৎ মৃত্যু ওদের কোথায় দাঁড় করিয়ে গেল। আমরা সবাই নিজের নিজের কথা ভেবে মরছি। স্বার্থ ব্যাপারটা কী বিচ্ছিরি, জাস্ট এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, একজন মৃত ব্যক্তি সামান্য সম্মানটুকু পেলেন না আমাদের কাছ থেকে ?
মধুমিতা উঠে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। বলে গেল, আমরা বড্ড খারাপ হয়ে গেছি।

বিশ্বজিৎ হাসল, বলল, এটা আজ বুঝলে ? যে যার নিজস্ব পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আছি আমরা।